1.2.2. ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল (Physiographic Regions) :

ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে ভারতকে পাঁচটি ভূপ্রাকৃতিক ও ভূমিরূপ অঞ্চলে (Physiographic and geomorphic regions) ভাগ করা যায় (সারণি 1.2.1), যথা—(1) দক্ষিণের উপদ্বীপীয় মালভূমি (Southern Peninsular Plateau), (2) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল (Northern Mountains), (3) উত্তরের সমভূমি অঞ্চল (Northern Plains), (4) উপকূলীয় সমভূমি (Coastal Plains) ও (5) দ্বীপপুঞ্জ (The Islands) (চিত্র 1.4)।

সারণি 1.2.1. : **ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল, ভূতাত্ত্বিক বয়স ও অবস্থান**

ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল	বয়স (প্রায়)	ভূতাত্ত্বিক উদ্ভবের শুরুর সময়	অবস্থান	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
1. দক্ষিণের উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল	400 কোটি বছর	আর্কিয়ান যুগ (era)	দক্ষিণের উপদ্বীপ	(i) দেশের প্রাচীনতম ভূখণ্ড; (ii) প্রধান ভূগঠন—ট্র্যাপ, শিল্ড; (iii) প্রধান ভূপ্রকৃতি—মালভূমি।
2. উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল	12 কোটি বছর	ক্রিটেশাস—টার্সিয়ারি উপযুগ (period)	উত্তরের পর্বতমালা	(i) দেশের নবীনতম ভঙ্গিল পর্বত; (ii) প্রধান ভূগঠন—ভাঁজ, চ্যুতি; (iii) প্রধান ভূপ্রকৃতি—পর্বত, উপত্যকা।
3. উত্তরের সমভূমি অঞ্চল	2·5-3·0 কোটি	অলিগোসিন-মিয়োসিন (মায়োসিন) অধিযুগ (epoch)	দক্ষিণের উপদ্বীপ ও উত্তরের পার্বত্য এলাকার মধ্যবর্তী অঞ্চল	(i) পৃথিবীর বৃহত্তম পলিগঠিত সমভূমি; (ii) প্রধান ভূগঠন—অবনমিত এলাকা যেখানে পলি-বালির সঞ্চয় হয়েছে; (iii) প্রধান ভূপ্রকৃতি—সমভূমি।
4. উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল	উপদ্বীপীয় উপকূল বয়সে খুব প্রাচীন; তবে বয়স অনির্দিষ্ট	উপদ্বীপীয় অঞ্চলে আর্কিয়ান ও গঙ্গা-পদ্মার মোহানায় টার্সিয়ারি সময়ে	বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের উপকূল	(i) সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও অবনমনের ফলে উপকূল এলাকার পরিবর্তন হয়েছে; (ii) ভূগঠন—মিশ্র প্রকৃতির; (iii) প্রধান ভূপ্রকৃতি—সমভূমি।
5. দ্বীপপুঞ্জ	(i) আন্দামান-নিকোবর—12 কোটি; (ii) লাক্ষাদ্বীপ—6 কোটি	(i) আন্দামান-নিকোবর—ক্রিটেশাস উপযুগ (ii) লাক্ষাদ্বীপ—টার্সিয়ারি উপযুগ	(i) আন্দামান-নিকোবর—বঙ্গোপসাগরে; (ii) লাক্ষাদ্বীপ—আরব সাগরের দক্ষিণে	(i) আন্দামান-নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপ ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে অবস্থিত; (ii) এদের সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম; (iii) ভূপ্রকৃতি—দ্বীপীয়, বন্ধুর।

ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলগুলিকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পুনরায় একাধিক ছোটো ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায় (সারণি 1.2.2)।

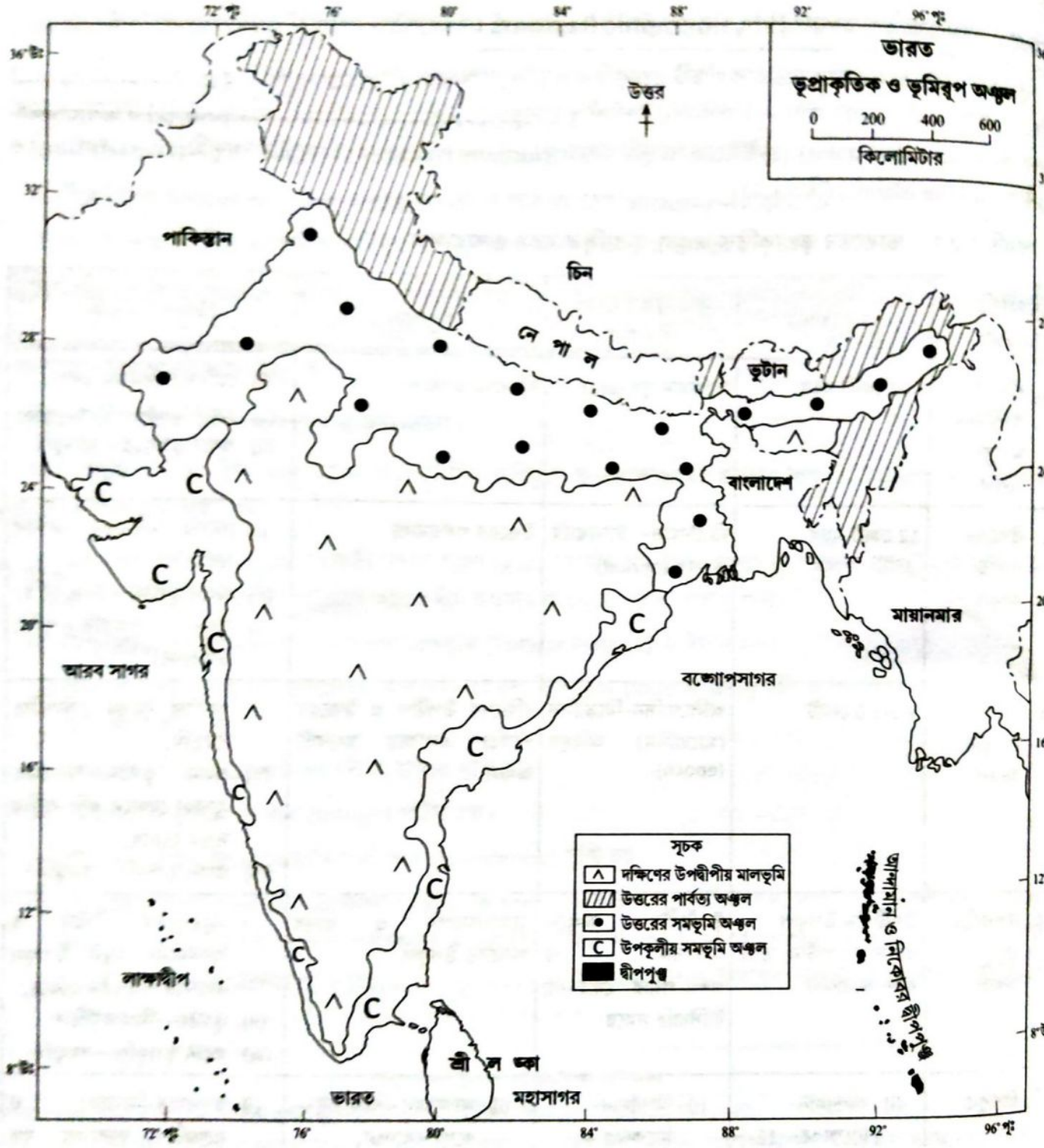

চিত্র : 1.4. - ভারতের ভূপ্রাকৃতিক ও ভূমিরূপ অঞ্চল

সারণি-1.2.2
ভারতের ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ ও ভূমিরূপ অঞ্চল

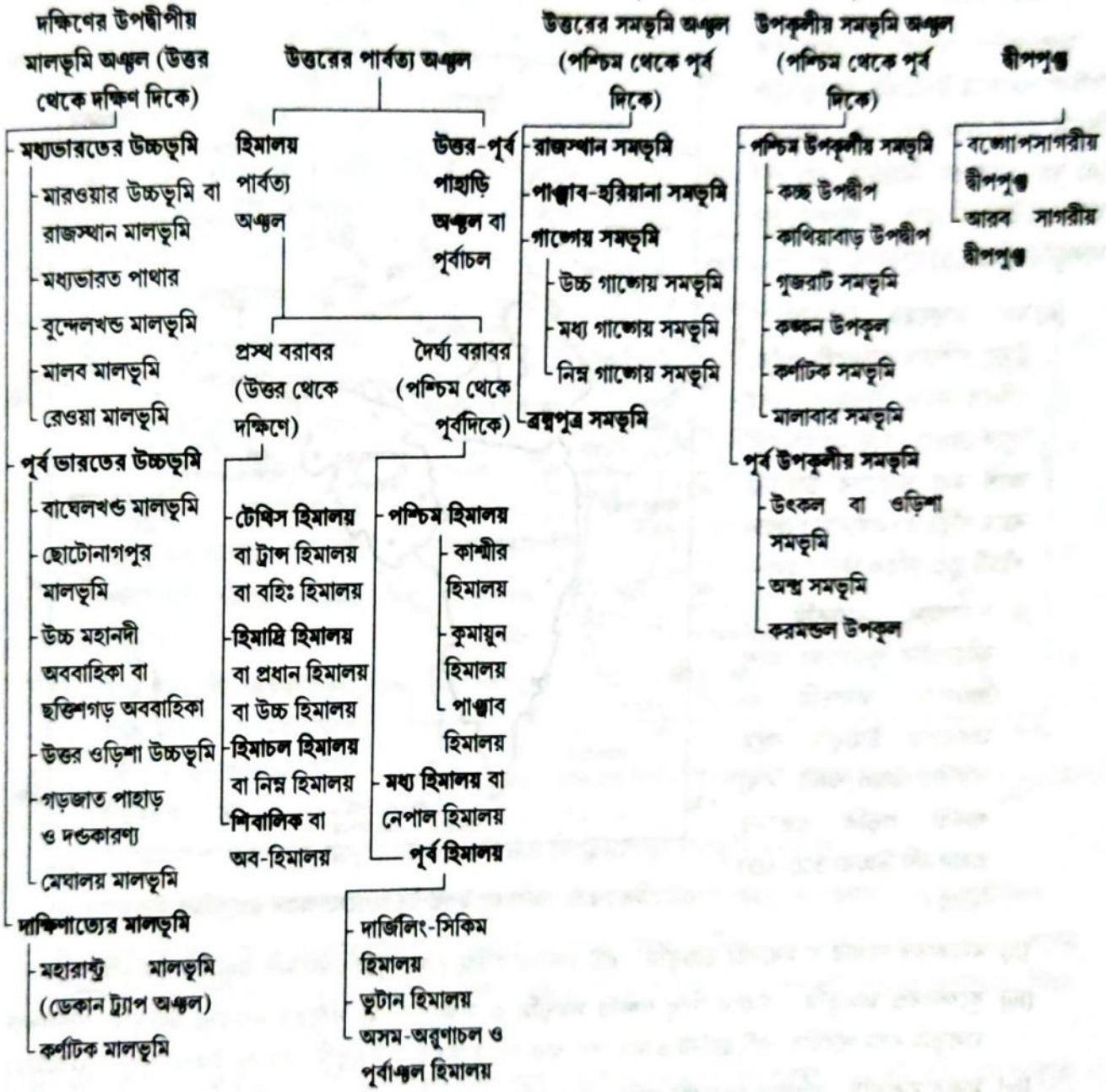

1.2.2.1. দক্ষিণের উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি (Physiography of the Southern Peninsular Plateau) :

অবস্থান অনুসারে ভারতের উপদ্বীপীয় অঞ্চল হল দেশের দক্ষিণ অংশের ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চল। এই অঞ্চলের প্রায় মধ্যভাগে রয়েছে সাতপুরা, মহাদেব ও মহাকাল পর্বত, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি পর্বত এবং পূর্বে পূর্বঘাট বা মহেন্দ্রগিরি পর্বত। এই অঞ্চলটি সিন্ধু-গঙ্গার সমভূমির দক্ষিণে অবস্থিত। কিছু ভৌগোলিকের মতে পশ্চিমে কচ্ছ, উত্তরে দিল্লি, পূর্বে রাজমহল পাহাড় ও দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপকে কোনো কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে মোটামুটি ভাবে ভারতীয় উপদ্বীপের সীমানা নির্ধারণ করা যায়।

ভারতের দক্ষিণ অংশের উপদ্বীপীয় অঞ্চল একটি বিশাল ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি (dissected plateau)। উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণদিকে ত্রিভুজাকৃতি উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল অবস্থিত। এই অংশের উত্তর-দক্ষিণে এবং পূর্ব-পশ্চিমে সর্বাধিক বিস্তার যথাক্রমে—1,600 কিলোমিটার ও 1,400 কিলোমিটার। এখানকার গড় উচ্চতা 600 থেকে 900 মিটার।

ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ : ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অনুসারে উপদ্বীপীয় মালভূমিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(A) মধ্য ভারতের উচ্চভূমি, (B) পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি এবং (C) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (চিত্র 1.5)।

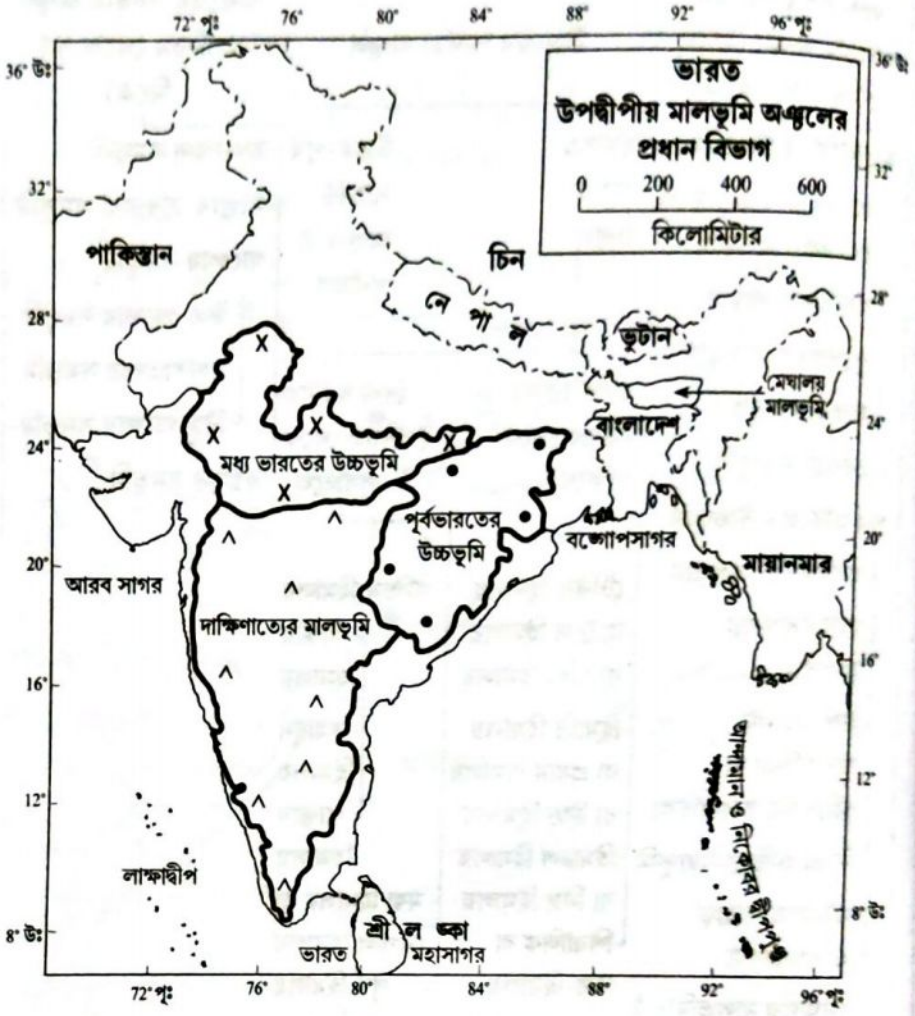

চিত্র : 1.5. - ভারতের উপদ্বীপীয় অঞ্চলের প্রধান ভূপ্রাকৃতিক বিভাগসমূহ

(A) মধ্য ভারতের উচ্চভূমি : উত্তর-পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বত, দক্ষিণে নর্মদা উপত্যকা এবং পূর্বে রেওয়া মালভূমির মধ্যবর্তী অংশ মধ্য ভারতের উচ্চভূমি নামে পরিচিত। এখানকার প্রধান পাঁচটি ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ হল—

(i) রাজস্থান মালভূমি : আরাবল্লীর পূর্বদিকের অংশ রাজস্থান মালভূমি বা মারওয়ার উচ্চভূমি নামে পরিচিত। চম্বল, কালী, সিন্দ, পার্বতী প্রভৃতি এখানের প্রধান নদী উচ্চতা 300–600 মিটার।

(ii) মধ্যভারত পাথার বা মধ্যবর্তী উচ্চভূমি : এটি মারওয়ার উচ্চভূমির পূর্বে চম্বল নদী অধ্যুষিত উচ্চভূমি।

(iii) বুন্দেলখণ্ড মালভূমি : উত্তরে সিন্ধু গঙ্গায় সমভূমি ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী উচ্চভূমি বুন্দেলখণ্ড মালভূমি নামে পরিচিত। এটি গ্র্যানিট ও নিস শিলা দ্বারা গঠিত ক্ষয়প্রাপ্ত উচ্চভূমি। এর গড় উচ্চতা 300–450 মিটার।

(iv) মালব মালভূমি : পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বত এবং পূর্বে বুন্দেলখণ্ড মালভূমির মধ্যবর্তী উচ্চভূমিকে মালব মালভূমি বলে।

(v) রেওয়া মালভূমি : বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত উচ্চভূমি রেওয়া মালভূমি নামে পরিচিত। একে রেওয়া-পান্না মালভূমিও বলে। (চিত্র 1.6)

(B) পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি : রেওয়া মালভূমির পূর্বদিকের অংশ পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি বা পূর্বের মালভূমি নামে পরিচিত। এই উচ্চভূমিকে পাঁচটি ছোটো ভূপ্রাকৃতিক অংশে ভাগ করা যায়, যেমন—

(i) বাঘেলখণ্ড মালভূমি : শোন নদীর দক্ষিণে চুনাপাথর, বেলেপাথর ও গ্র্যানিট শিলা দ্বারা গঠিত মালভূমি বাঘেলখণ্ড মালভূমি নামে পরিচিত। এটি মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। এর গড় উচ্চতা 500 মিটার।

(ii) **ছোটোনাগপুর মালভূমি :** বাঘেলখণ্ডের পূর্বদিকে প্রধানত আর্কিয়ান যুগের (250 থেকে 400 কোটি বছরের পুরানো) শিলা দ্বারা গঠিত ছোটোনাগপুর মালভূমি অবস্থিত। এটি প্রকৃতপক্ষে রাঁচি মালভূমি, হাজারিবাগ মালভূমি ও কোডার্মা মালভূমির সমষ্টি। এই মালভূমির গড় উচ্চতা 1,100 মিটার-এর কাছাকাছি। এই অঞ্চল 'প্যাট' বা 'পাট' (Pat) নামে পরিচিত। ছোটোনাগপুর মালভূমির সর্বোচ্চ অংশ হল পরেশনাথ পাহাড় (1,366 মিটার)।

চিত্র : 1.6. - ভারতের উপদ্বীপীয় মালভূমির অন্তর্গত মালভূমি ও পাহাড়

(iii) **উচ্চ মহানদী অববাহিকা :** বাঘেলখণ্ড মালভূমির দক্ষিণে শ্লেট ও চুনাপাথরে গঠিত অঞ্চলকে উচ্চ মহানদী অববাহিকা বা ছত্তিশগড় সমভূমি বলে। এর উত্তরে ছোটোনাগপুর মালভূমি অবস্থিত।

(iv) **গড়জাত পাহাড় ও দণ্ডকারণ্য :** ছত্তিশগড় সমভূমির দক্ষিণাংশ গড়জাত পাহাড় ও দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত।

(v) **মেঘালয় মালভূমি :** মেঘালয় মালভূমি মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত। এটি ভূগঠন অনুসারে প্রি-ক্যামব্রিয়ান পর্বের গণ্ডোয়ানা ভূমিভাগের অংশ। এখানে মিকির পাহাড়, গারো পাহাড়, খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড় অবস্থিত। শিলং (1,525 মিটার) এখানকার সর্বোচ্চ স্থান।

(C) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি : উপদ্বীপীয় মালভূমির সর্ব বৃহৎ ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলটি হল দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। এর আকৃতি ত্রিভুজের মতো। মালভূমিটির তিনটি অংশ, যথা—

(i) **মহারাষ্ট্র মালভূমি বা ডেকান ট্র্যাপ :** দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পশ্চিমাংশ মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত। ব্যাসল্ট শিলা গঠিত এই অঞ্চলটি মহারাষ্ট্র মালভূমি নামে পরিচিত। এলাকাটি বিভিন্ন সময়ে বিদার অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ধাপে ধাপে নেমে গেছে। তাই এই অঞ্চলের আরেক নাম ডেকান ট্র্যাপ (Deccan Trap)। এই অঞ্চলটি লাভাজাত কালো রঙের মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত বলে একে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা বা রেগুর মৃত্তিকা অঞ্চলও বলে। এই মাটিতে কার্পাস চাষ ভালো হয়।

(ii) **কর্ণাটক মালভূমি :** মহারাষ্ট্র মালভূমির দক্ষিণে অবস্থিত মালভূমিকে কর্ণাটক মালভূমি বা মহীশূর মালভূমি বলে। এই মালভূমির পশ্চিম দিকের বন্ধুর ভূপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চল মালনাদ এবং পূর্বের অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিভাগ ময়দান নামে পরিচিত। মালনাদ একটি কন্নড় শব্দ। এর অর্থ হল পাহাড়ী এলাকা।

(iii) **তেলঙ্গানা মালভূমি** : নবগঠিত তেলঙ্গানা রাজ্যের স্বল্প উচ্চতা (500 থেকে 600 মিটার) বিশিষ্ট মালভূমি তেলঙ্গানা মালভূমি নামে পরিচিত। প্রি-ক্যামব্রিয়ান পর্বের নিস শিলা দিয়ে এই মালভূমি গঠিত।

উপদ্বীপীয় মালভূমির বিভিন্ন পর্বতশ্রেণি : উপদ্বীপীয় মালভূমির বিভিন্ন অংশ একাধিক পর্বতশ্রেণি ও নদী-উপত্যকার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এখানকার পর্বতশ্রেণিগুলি প্রকৃতিগত দিক থেকে অবশিষ্ট পাহাড় বা ক্ষয়জাত পাহাড়। এই অঞ্চলের প্রধান পর্বত ও পর্বতশ্রেণি হল—

(i) **আরাবল্লী** : এটি ভারতের প্রাচীনতম এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ক্ষয়জাত পর্বত। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 400 কিমি। এটি রাজস্থানের মালভূমি বা মারওয়ার উচ্চভূমির পশ্চিমে অবস্থিত। **গুরুশিখর** (1,722 মি.) এবং **মাউন্ট আবু** (1,158 মি.)-এর দুটি প্রধান শৃঙ্গ। দিল্লি থেকে আমেদাবাদ পর্যন্ত আরাবল্লী বিস্তৃত।

(ii) **বিন্ধ্য পর্বত** : এটি একটি প্রাচীন স্তূপ পর্বত। এর পূর্বাংশকে **কাইমুর** বা কাইশের (Kaimur) বলে। নর্মদার উত্তরদিকে বিন্ধ্য পর্বত অবস্থিত। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল **মানপুর** (881 মি.)। বিন্ধ্য একাধিক শৈলশিরা, মালভূমি এবং এসকারপ্‌মেন্ট (escarpment)-এর সমষ্টি। পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে ছত্তিশগড় পর্যন্ত বিন্ধ্য বিস্তৃত। বিন্ধ্য অধ্যুষিত এলাকাকে **বিন্ধ্যাচল** (Vindhyachal) বলে।

(iii) **সাতপুরা-মহাদেব-মহাকাল পর্বতশ্রেণি** : এটি একটি প্রাচীন স্তূপ পর্বত। নর্মদা ও তাপ্তি নদীর মধ্যে এই পর্বতশ্রেণি অবস্থিত। এর প্রধান দুটি শৃঙ্গ হল **ধূপগড়** (1,350 মি.) ও **অমরকন্টক** (1,127 মি.)।

(iv) **পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বা সহ্যাদ্রি** : এটি একটি প্রাচীন স্তূপ পর্বত। ডেকান ট্র্যাপের পশ্চিমে আরব সাগরের উপকূল বরাবর এই পর্বতমালা অবস্থিত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় নাসিকের কাছে **থলঘাট** ও পুনের কাছে **ভোরঘাট** গিরিপথ আছে। সহ্যাদ্রির দৈর্ঘ্য প্রায় 1,600 কিমি.। এর প্রধান শৃঙ্গ হল **ভাভুলমালা** (2,339 মি.), **কলসুবাই** (1,646 মি.) এবং **মহাবালেশ্বর** (1,348 মি.)।

(v) **নীলগিরি-আনাইমালাই-কার্ডামাম-পালনি পর্বতশ্রেণি** : **পালঘাট গ্যাপ** (ইংরেজি "গ্যাপ" মানে অগভীর গিরিপথ) নীলগিরি পর্বতশ্রেণিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। আনাইমালাই পর্বতের **আনাইমুদি** (2,695 মি.) দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এ ছাড়া আরো একটি শৃঙ্গ হল **দোদাবেত্তা** বা দোদাবেতা (2,637 মি.)।

(vi) **পূর্বঘাট পর্বতমালা বা মলয়াদ্রি** : এটি ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর বিস্তৃত কয়েকটি ক্ষয়জাত পর্বতের সমষ্টি। এখানকার উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ হল **জিন্দাগাদা** (1,690 মি.), **আর্মাকোন্ডা** (1,680 মি) ও **মহেন্দ্রগিরি** (1,501 মি.)।

1.2.2.2. দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ও ভূগঠনের মধ্যে সম্পর্ক (Interrelationship between Physiography and Structure of Southern Peninsular Plateau or Deccan Plateau) :

ভারতের দাক্ষিণাত্য বা **উপদ্বীপীয় অঞ্চল হল পৃথিবীর অতিপ্রাচীন স্থলভাগগুলির মধ্যে অন্যতম**। আজ থেকে প্রায় 400 কোটি (4000 মিলিয়ন) বছর আগে ভূত্বকের ওপরের অংশটি যখন শীতল ও কঠিন হয়ে উঠেছিল তখন অর্থাৎ প্রি-ক্যামব্রিয়ান (Pre-Cambrian) যুগে যে প্রাচীন শিলার উৎপত্তি হয়, সেই শিলা দিয়ে ভারতের দাক্ষিণাত্যের ভূগাঠনিক ভিত তৈরি হয়েছে। এই শিলা-ভিতের ওপরে অন্যান্য নবীন শিলা বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক সময়ে জন্ম নিয়েছে এবং ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপীয় মালভূমি তার বর্তমান আকার ও আয়তন লাভ করেছে।

ভারতের দাক্ষিণাত্যের প্রাচীনতম শিলাগঠিত বুনিয়াদ বা ভিত্তিকে ভূতাত্ত্বিকভাবে **"ফানডামেনটাল কমপ্লেক্স"** (Fundamental Complex) বা **"বেসমেন্ট কমপ্লেক্স"** (Basement Complex) বলে।

♦ **শিল্ড :** ভূগঠন অনুসারে ভারতের উপদ্বীপীয় অঞ্চল হল একটি শিল্ড (Shield)। "শিল্ড" বলতে প্রাচীন মহাদেশীয় ভূত্বককে (Continental Crust) বোঝায়, যেটি অতিপুরাতন আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলা দিয়ে তৈরি, আয়তনে বিশাল এবং ভূগাঠনিক ভাবে স্থিতিশীল (stable) প্রকৃতির। শিল্ড একাধিক **ক্রেটন** (Craton) দিয়ে তৈরি হয়। ক্রেটন হল অতিপ্রাচীন শিলাগঠিত ছোটো মহাদেশীয় ভূখণ্ড।

♦ **ক্রেটন :** ভারতের উপদ্বীপীয় শিল্ড অঞ্চলে ছয়টি বড়ো ক্রেটন (craton) আছে। যেমন—(i) দক্ষিণে ধারওয়ার ক্রেটন বা কর্ণাটক ক্রেটন (Dharwar Craton/Karnataka Craton), (ii) মধ্যভাগে বস্তার ক্রেটন বা বস্তার-ভান্ডারা (Bastar Craton/ Bastar-Bhandara Craton), (iii) উত্তর-পূর্বে সিংভূম ক্রেটন বা সিংভূম-ওড়িশা ক্রেটন (Singbhum Craton/Singbhum-Orissa Craton), (iv) পূর্ব ভারতে ছোটোনাগপুর নিস কমপ্লেক্স (Chhotanagpur Gneiss Complex), (v) উত্তরে রাজস্থান-বুন্দেলখন্ড ক্রেটন (Rajasthan Bundelkhand Craton) [যাকে আরাবল্লী ক্রেটনও বলা হয়] এবং (vi) ভারতীয় শিল্ডের সবচেয়ে পূর্বদিকে অবস্থিত মেঘালয় ক্রেটন (Meghalaya Craton) (চিত্র 1.7)।

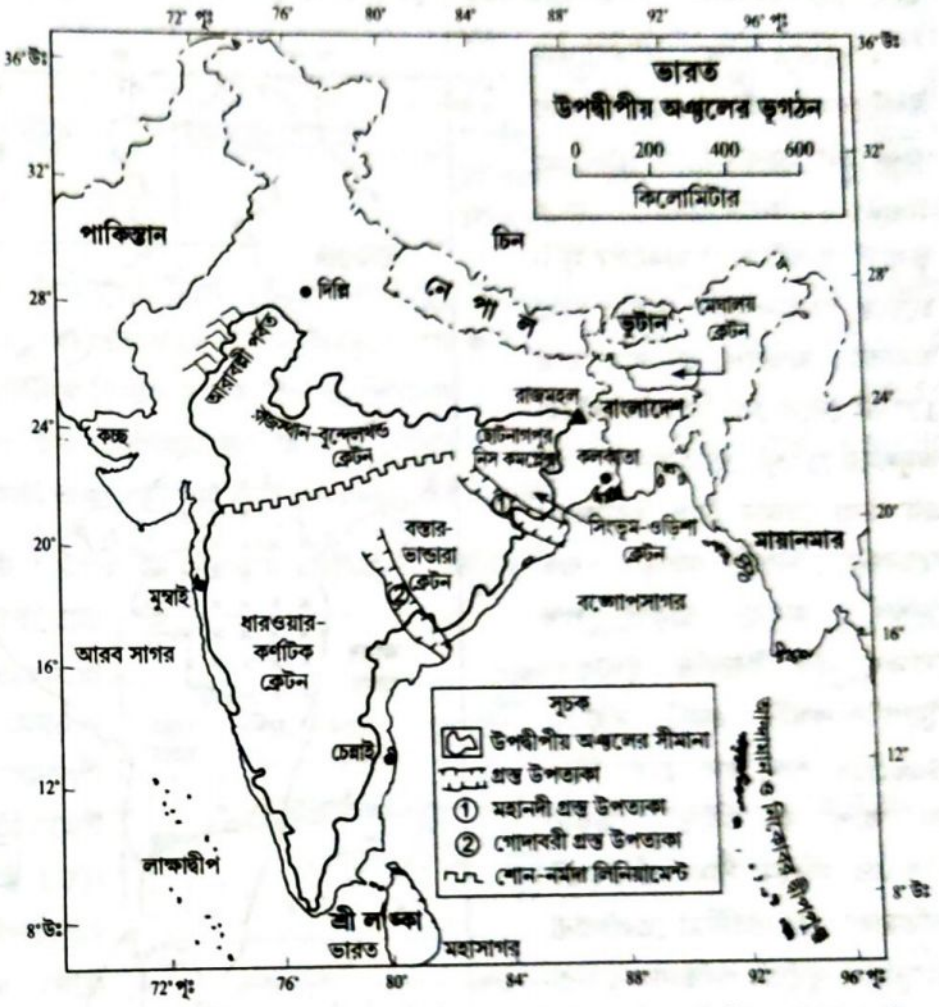

চিত্র : 1.7. - ভারতের উপদ্বীপীয় অঞ্চলে ক্রেটন, গ্রস্ত উপত্যকা ও লিনিয়ামেন্ট-এর বণ্টন

♦ **ক্রেটন সীমানার বৈশিষ্ট্য :** উপদ্বীপীয় অঞ্চলের ক্রেটনগুলি মহাদেশীয় ভূত্বক (Continental Crust)-এর অংশ, যাদের সীমানা বরাবর কোথাও প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত, কোথাও গ্রস্ত উপত্যকা বা কোথাও লিনিয়ামেন্ট (অর্থাৎ ভূগাঠনিক শৈলশিরা) আছে, যেমন—

(i) রাজস্থান-বুন্দেলখণ্ড ক্রেটনের পশ্চিমে রয়েছে আরাবল্লী পর্বত;

(ii) সিংভূম ও বস্তার ক্রেটনের সীমান্তে আছে মহানদী গ্রস্ত উপত্যকা;

(iii) বস্তার ও ধারওয়ার ক্রেটনের সীমানায় গোদাবরী গ্রস্ত উপত্যকা;

(iv) শোন-নর্মদা নদী-অববাহিকায় অবস্থিত ভূগাঠনিক শৈলশিরা বা লিনিয়ামেন্ট ইত্যাদি (চিত্র 1.7)।

ভারতীয় উপদ্বীপের ক্রেটনগুলি প্রি-ক্যামব্রিয়ান (Pre-Cambrian) যুগের। বয়সের ভিত্তিতে এগুলি অতিপ্রাচীন। অন্তত 400 কোটি (4000 মিলিয়ন) বছরেরও বেশি পুরনো।

১৫.০৬ কার্পাস-বয়নশিল্প (Cotton Textile Industry)

কার্পাস বয়ন কৃষিজাত পণ্য-নির্ভর শিল্প। তুলা কার্পাস-বয়নশিল্পের প্রধান কাঁচামাল।

■ **কার্পাস-বয়নশিল্পের উপর কাঁচামালের প্রভাব :** কার্পাস-বয়নশিল্পের প্রধান কাঁচামাল হল তুলা। এটি বিশুদ্ধ বা Pure শ্রেণির কাঁচামাল। ওয়েবার-এর সূচক অনুযায়ী তুলার কাঁচামাল সূচক হল '১'। অর্থাৎ ১ টন তুলা থেকে ১ টন সুতো উৎপাদন করা যায়। তুলা বিশুদ্ধ শ্রেণির কাঁচামাল হওয়ার জন্য কার্পাস-বয়নশিল্প তুলা উৎপাদক অঞ্চলে বা বাজারের নিকটবর্তী এলাকায় অথবা অন্য যে-কোনো অনুকূল স্থানে গড়ে উঠতে পারে। লৌহ-ইস্পাত শিল্পের মতো কার্পাস-বয়নশিল্প সবসময় কাঁচামাল যেখানে পাওয়া যায় সেখানে না-ও গড়ে উঠতে পারে।

ভারতের মুম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি কার্পাস-বয়নশিল্পের কেন্দ্রগুলি তুলা উৎপাদক অঞ্চলে অবস্থিত। পক্ষান্তরে চেন্নাই, হায়দরাবাদ, কটক, লুধিয়ানা প্রভৃতি স্থানে গড়ে ওঠা কার্পাস-বয়নশিল্প তুলা উৎপাদক অঞ্চলে অবস্থিত নয়।

■ **কার্পাস-বয়নশিল্পের উপর বাজারের প্রভাব :** কার্পাস-বয়নশিল্প বাজারে কাছাকাছি বা বাজারে গড়ে উঠতে পারে। কারণ জামাকাপড়ের চাহিদা কার্পাস-বয়নশিল্পের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। চাহিদা যেখানে বেশি কার্পাস-বয়নশিল্পের সংখ্যা সেখানে তত বেশি।

■ **কার্পাস-বয়নশিল্পের উপর রুচির প্রভাব :** মানুষের রুচি বা style কার্পাস-বয়নশিল্পের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কারণ কাপড়ের রং, মান, ডিজাইন প্রভৃতি মানুষের রুচির উপর নির্ভরশীল। সে-কারণে কার্পাস-বয়নশিল্প বাজারের কাছাকাছি গড়ে ওঠে।

■ **কার্পাস-বয়নশিল্পের উপর ক্রেতা সংযোগের প্রভাব :** ক্রেতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা কার্পাস-বয়নশিল্পের একটি বিশেষ দিক। সে-কারণের জন্যও এই শিল্পটি বাজারের কাছে গড়ে ওঠে।

০১ চিনের কার্পাস-বয়নশিল্প *(Cotton Textile Industry in China)*

কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনে চিন পৃথিবীর অন্যতম অগ্রণী দেশ। সাংহাই, তিয়ানজিন, ঝেংজাউ (Zhengzhou), শ্যাসি (Shashi), বেজিং, জিয়ান (Xian), জিয়ানিয়াং (Xianyang), প্রভৃতি চিনে কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র (চিত্র ১৫.১২)। তিয়ানজিন ও সন্নিহিত অঞ্চল দেশে সুতিবস্ত্র উৎপাদনের আদিভূমি। এ-কারণেই সাংহাই-কাইতেং-শানটুং এবং তিয়ানজিন এই চারটি শহরের মধ্যে আবদ্ধ বিরাট অঞ্চলে দেশের প্রায় ৫৫ শতাংশ কার্পাস-বয়নশিল্পের

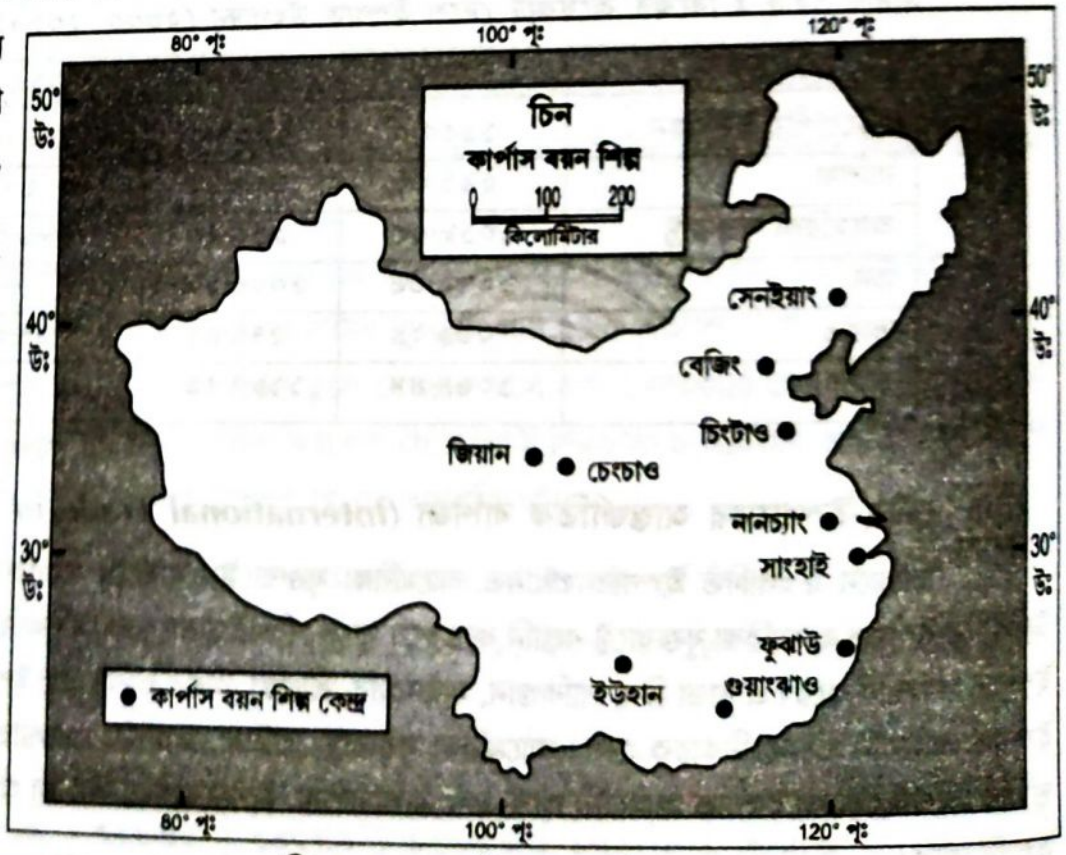

চিত্র ১৫.১২ : চিনের কার্পাস বয়ন শিল্প

একদেশিভবন ঘটেছে। তবে দেশে কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর, অন্যান্য যে যে স্থানে কার্পাস-বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে সেগুলি হল বেজিং-হ্যাংকাও শিল্পাঞ্চল এবং সিংটাই, পাওটিং প্রভৃতি শহর। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চিনের সুতিবস্ত্র কারখানাগুলি অধিকাংশই ছোটো মাপের। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন এ-জাতীয় মিলগুলিতে বাড়ে, তেমনি সুতি বস্ত্রের উৎপাদন ব্যয়ও কম হয়। সিকিয়াং-ইয়াংসিকিয়াং নদী অববাহিকা, উই-হো নদী উপত্যকা এবং জেচুয়ান অঞ্চলে উৎপাদিত তুলা; সুলভ শ্রমিক; বিশাল বাজার; পরিবহনের সুবিধা প্রভৃতি অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগে আলোচ্য অঞ্চলগুলিতে কার্পাস-বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে।

০২ ভারতের কার্পাস-বয়নশিল্প (Cotton Textile Industry in India)

কার্পাস-বয়নশিল্প পৃথিবীর বৃহত্তম ও প্রাচীনতম যন্ত্রচালিত শিল্প। ভারতের মোট শিল্প-শ্রমিকের এক-তৃতীয়াংশ এই শিল্পে নিযুক্ত। আলোচ্য শিল্পটি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় পুঁজি ও উদ্যোগে গঠিত। এটি ভারতের অন্যতম ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প। কার্পাস-বয়নশিল্প ভারতের সমস্যাপীড়িত শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। ভারতে প্রতি বছর যে পরিমাণ শিল্পজাতদ্রব্য উৎপাদন করা হয় তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বয়নশিল্পজাত। কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। ভারতে বর্তমানে প্রায় ১২০০টি বড়ো এবং মাঝারি মাপের কাপড়ের মিল (mill) আছে। দেশে উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ গড়ে বছরে ১০,০০০ লক্ষ কেজি। এই শিল্পের বিকাশের হার বছরে ১৬ শতাংশ। বিশ্বের বস্ত্র বাজারের ৭ শতাংশ ভারতের অধীনে রয়েছে। স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) ৪ শতাংশ কার্পাস বয়ন শিল্প থেকে আসে। সারা দেশে প্রায় ৩.৮ কোটি শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে।

১৫.৩.২.১ বিকাশ (Growth)

ভারতীয় কার্পাস-বয়নশিল্পের বিবর্তনকে মোট ছ'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়, যেমন—

(১) প্রথম পর্যায় (১৮১৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত) : এই সময়ে ব্রোচ, সুরাট, নবসারি, কালিকট প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত কুটিরশিল্প-কেন্দ্রিক ভারতের কার্পাস বয়ন ব্যবস্থা ইংরেজদের দমনমূলক নীতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(২) দ্বিতীয় পর্যায় (১৮১৮–১৯১৪) : ১৮১৮ সালে কলকাতার কাছে ঘুষুড়িতে প্রথম যন্ত্রচালিত সুতিকল প্রতিষ্ঠিত হয়। মুম্বাইতে সুতিশিল্পের প্রবর্তন হয় আরও কিছু পরে, ১৮৫১ সালে। দামোদর অঞ্চলে ১৮২০ সাল নাগাদ কয়লার আবিষ্কার এবং ১৮৫৩ সালে মুম্বাই এবং থানে ও হাওড়া এবং রানীগঞ্জের মধ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন, কার্পাস-বয়নশিল্প গড়ে ওঠার অনুকূল পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। ফলে ১৮৯০ সালের মধ্যে মুম্বাই অঞ্চলে প্রায় ৭০টির মতো সুতাকল (Spinning mill) প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] এই সময়ে ভারতীয় সুতা চিনের বাজারে মুম্বাই-হংকং বন্দর মারফত চালান দেওয়া শুরু হয়। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে চিনে সামাজিক ও রাজনৈতিক গোলযোগ আরম্ভ হওয়ার ফলে ভারতীয় সুতাকলগুলির ব্যবসায়িক স্বার্থ বিপন্ন হয়।

(৩) তৃতীয় পর্যায় (১৯১৫–১৯২৫) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে চিনদেশে ভারতীয় সুতার ইংরেজ পরিচালিত রপ্তানি বাজার সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় এবং এই বিরাট বাজারের উপর জাপানের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় কার্পাস-বয়নশিল্পের এই সংকটের সময় বহু পুরাতন সুতাকল (Spinning mills) বন্ধ হয়ে যায় এবং যে-সমস্ত মিলগুলি ওই সংকট কাটিয়ে ওঠার অবকাশ পায়, সেগুলি বৈদেশিক রপ্তানির পরিবর্তে দেশীয় বাজারে বস্ত্রসম্ভার জোগান দেয়। ফলে সুতাকল ছাড়াও, বয়নকল (Weaving mills) এবং সম্পূরিত বয়ন প্রতিষ্ঠান (Composite mills) — যেখানে সুতা ও বস্ত্র একই ছাদের নীচে উৎপাদন করা যায়, এমন কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে।

---

[১] *Sinha, B.N. (1972). Industrial Geography of India.*

(৪) চতুর্থ পর্যায় (১৯২৬–১৯৪৭) : এই পর্যায়ে উপকূলবর্তী কার্পাস-বয়ন কেন্দ্রগুলি ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে বেশ কিছু বয়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই নতুন কেন্দ্রগুলি কাঁচামাল ও বাজারের নিকটবর্তী হওয়ায় অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রভাব দেশের কার্পাস-বয়নশিল্পের উপর বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। কারণ দেশ বিভাগের ফলশ্রুতি হিসেবে সিন্ধু উপত্যকার উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদক অঞ্চলগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে ভারতীয় কার্পাস-বয়নশিল্পে কাঁচামালের সংকট দেখা দেয়।

(৫) পঞ্চম পর্যায় (১৯৪৮–১৯৫০) : স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে সরকারের গৃহীত নীতি অনুসারে হস্তচালিত তাঁতকে মিলের চেয়ে বেশি সাহায্য দেওয়া শুরু হয়। তা ছাড়া, এই সময় বিদেশ থেকে উৎকৃষ্টমানের তুলা আমদানির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দেশজ বস্ত্রের রপ্তানি বাজারে ভারত, জাপান-ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র-চিন প্রভৃতি দেশের কাছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়।

(৬) ষষ্ঠ পর্যায় (১৯৫১ থেকে পরবর্তী কাল) : ১৯৫১ সালে দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগ শুরু হয়।

১৫.৩.২.২ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতে কার্পাস-বয়নশিল্পের অগ্রগতি (Development of Indian Cotton Textile Industry during the Plan Periods)

১৯৫১ সালে পরিকল্পনা কালের আরম্ভে দেশে ১০৩টি সুতাকল এবং ২৭৫টি সুতা ও বয়ন-কল ছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালেই বস্ত্রের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়। এই সময় থেকে কার্পাস-বয়নশিল্প তিন ভাগে বিভক্ত, যেমন— (১) মিল ক্ষেত্র; (২) হ্যান্ডলুম ক্ষেত্র এবং (৩) পাওয়ারলুম ক্ষেত্র। দেশের মিল ক্ষেত্রটি কেন্দ্রীভূত বা সংগঠিত চরিত্রের এবং হ্যান্ডলুম ও পাওয়ারলুম ক্ষেত্রকে বিকেন্দ্রিত ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে উৎপাদিত মোট কাপড়ের প্রায় ৮০% মিল ক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত হত। কিন্তু সরকারি নীতির প্রভাবে মিল ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভ পর্যন্ত কার্পাস-বয়ন ছিল দেশের বৃহত্তম শিল্পক্ষেত্র। ১৯৫৮ সালের মে মাসে সরকার শ্রী ডি. এস. যোশীর নেতৃত্বে (যোশী কমিটি) এই শিল্পের 'র‍্যাশানালাইজেশন'-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি পুরাতন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে ভারতীয় বস্ত্রের উৎপাদন ব্যয় প্রতিযোগিতামূলক নয় বলে মনে করেন। ফলে উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করা হয়।

পরবর্তীকালে ভারতীয় বস্ত্রবয়ন শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে নিজের অবস্থান ধীরে ধীরে সুসংহত করেছে। ২০১৩–১৪ আর্থিক বছরে বয়ন ক্ষেত্রে ভারতীয় মোট রপ্তানির মূল্য অনুসারে প্রায় ২৮.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।[১] বস্তুত আন্তর্জাতিক স্তরে Multi Fibre Arrangement (MFA) চালু হওয়ার পর থেকে ভারতীয় বয়ন ক্ষেত্রে দক্ষতা, উৎপাদন এবং কারিগরী আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা বেড়েছে।

১৫.৩.২.৩ ভারতে কার্পাস-বয়নশিল্পের বণ্টন (Distribution of Cotton Textile Industry in India)

কার্পাস-বয়ন একটি বিশুদ্ধ শ্রেণির কাঁচামাল (Pure Raw Material) ("মেটিরিয়াল ইনডেক্স" বা পণ্যসূচক = ১)-নির্ভর শিল্প হওয়ার জন্য বাজার বা কাঁচামালের উৎস বা এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী যে-কোনো অনুকূল জায়গায় গড়ে উঠতে পারে (চিত্র ১৫.১৩)। ভারতেও এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।

সারা ভারতে কার্পাস-বয়নশিল্পের ভৌগোলিক বণ্টনকে চারটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়, যথা —

[১] India, 2015., Govt. of India

অঞ্চল	রাজ্য	কার্পাস-বয়নশিল্পের প্রধান কেন্দ্র
পশ্চিমাঞ্চল	মহারাষ্ট্র	মুম্বাই, কোলাপুর, নাগপুর, পুনে, শোলাপুর, জলগাঁও।
	গুজরাট	আমেদাবাদ, ভাদোদরা, সুরাট, ভবনগর, রাজকোট, পোরবন্দর।
	মধ্যপ্রদেশ	ইন্দোর, গোয়ালিয়র, ভূপাল, উজ্জয়িনী, ঝাঁসি।
দক্ষিণাঞ্চল	তামিলনাড়ু	কোয়েম্বাটুর, চেন্নাই, মাদুরাই, তিরুনেলভেলি, সালেম।
	কর্ণাটক	বেঙ্গালুরু, দাভাঙ্গেরে, মহীশূর, হুবলী, গোকক।
	কেরালা	তিরুবনন্তপুরম, কুইলন, কোচি, কোঝিকোড়।
	অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানা	হায়দরাবাদ, গুন্টুর, তিরুপতি, ওয়ারংগল।
উত্তরাঞ্চল	উত্তরপ্রদেশ	কানপুর, মোদিনগর, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, এলাহাবাদ।
	রাজস্থান	ভিলওয়ারা, শ্রীগঙ্গানগর, জয়পুর, কোটা, যোধপুর।
	হরিয়ানা	হিসার, ভিওয়ানি, সিরসা।
	পাঞ্জাব	অমৃতসর, লুধিয়ানা, ফাগোয়ারা, জলন্ধর।
পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমবঙ্গ	হাওড়া, শ্যামনগর, সোদপুর, পানিহাটি, কলকাতা, ফুলেশ্বর, বেলঘরিয়া, শ্রীরামপুর, মৌরিগ্রাম।
	বিহার	পাটনা, গয়া।
	ওড়িশা	কটক, ভুবনেশ্বর।

চিত্র ১৫.১৩ : ভারতের কার্পাস-বয়নশিল্পের কেন্দ্রসমূহ

১৫.৩.২.৪ ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ঃ মুম্বাই এবং আমেদাবাদ অঞ্চলে কার্পাস-বয়নশিল্পের একদেশিকতার কারণ (Factors of Localisation of Cotton Textile Industry in Mumbai and Ahmedabad in Western Zone of India)

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে মুম্বাই এবং আমেদাবাদ ভারতে কার্পাস-বয়নশিল্পের অন্যতম পীঠস্থান। ১৮৫১ সালে মুম্বাইতে সুতাকল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে শিল্পায়নের শুরু, পরবর্তী পর্যায়ে আঞ্চলিক অনুকূল পরিমণ্ডল ও দেশের আর্থ-সামাজিক ঘটনা প্রবাহের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে তা' মুম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে কার্পাস-বয়নশিল্পের একদেশিভবনে পরিণত হয়। যে-সমস্ত কারণের জন্য একদেশিভবন সম্ভব হয়েছে, সেগুলি হল—

একদেশিকতার কারণ	মুম্বাই অঞ্চল	আমেদাবাদ অঞ্চল
কাঁচামাল	মহারাষ্ট্রের কৃষ্ণ-কার্পাস মাটি বা "ব্ল্যাক কটন সয়েল" অঞ্চলে অবস্থিত জলগাঁও, বুলদানা, অমরাবতী, আকোলা, ইয়োৎমল প্রভৃতি জেলায় উৎপাদিত তুলা মুম্বাই ও সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত সুতা ও বয়ন কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়।	গুজরাটের কৃষ্ণ কার্পাস মাটি বা "ব্ল্যাক কটন সয়েল" অঞ্চলে অবস্থিত ভারুচ, ভদোদরা, সুরেন্দ্রনগর, আমেদাবাদ প্রভৃতি জেলায় উৎপাদিত তুলা আমেদাবাদ এবং সন্নিহিত অঞ্চলে স্থাপিত সুতা ও বয়ন-কলগুলিতে সরবরাহ করা হয়।
শক্তি	মুম্বাই-এর কার্পাস-বয়নশিল্প আমদানি করা কয়লার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠলেও, খোপোলি, ভীরা, ভিবপুরী, নীলামুলা, লোনাভলা প্রভৃতি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি পরে স্থানীয় চাহিদা মেটায়।	আমেদাবাদ অঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ে জ্বালানি সম্পদের অভাব, পরবর্তীকালে গড়ে তোলা উকাই জলবিদ্যুৎ এবং ধুভারণ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিপূরণ করা হয়।
পরিবহন	১৮৫৩ সালে প্রথমে মুম্বাই এবং থানে এবং পরবর্তী পর্যায়ে মহারাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলির মধ্যে রেলপথ সম্প্রসারিত হয়। ফলে তুলা উৎপাদক অঞ্চল এবং সুতা ও বয়ন কেন্দ্রের মধ্যে গড়ে ওঠা রেল যোগাযোগ বন্দোবস্ত এই শিল্পের দ্রুত একদেশিভবনে সাহায্য করে। দেশের পশ্চিম রেলপথের অবদান এ-বিষয়ে অনস্বীকার্য।	মুম্বাই-থানে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমশ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে গুজরাটের তুলা উৎপাদক অঞ্চলের সঙ্গে আমেদাবাদ-কেন্দ্রিক বয়নশিল্পের যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়। বর্তমানে রেল ও সড়ক পথে পণ্য আদান-প্রদানের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।
বন্দর	কার্পাস-বয়নশিল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে মুম্বাই বন্দরের মাধ্যমে ট্রান্সভাল-নাটাল থেকে কয়লা, ব্রিটেনের যন্ত্রপাতি এবং মিশর-সুদান-কেনিয়া অঞ্চল থেকে উন্নতমানের দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা আমদানি করা হত। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে এবং অভ্যন্তরীণ কয়লার জোগান সুনিশ্চিত হওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কয়লা আনার প্রয়োজন হয়নি। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে ভারতীয় তুলা রপ্তানির ক্ষেত্রে মুম্বাই বন্দরের অবদান অসামান্য।	আমেদাবাদ অঞ্চলের সুতা ও বস্ত্রকলগুলি শিল্পায়নের প্রথম যুগে মুম্বাই বন্দরে উপর নির্ভর করলেও, কান্দলা, ওখা, পোরবন্দর, সুরাট, মুন্দ্রা প্রভৃতি আঞ্চলিক বন্দরগুলি চালু হওয়ার পর থেকে মুম্বাই-এর উপর নির্ভরতার মাত্রা বহুলাংশে হ্রাস পায়। কার্পাস ও বস্ত্রসামগ্রীর রপ্তানি এবং দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা ও যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য এই রাজ্যের বন্দরের গুরুত্ব অসীম।

একদেশিকতার কারণ	মুম্বাই অঞ্চল	আমেদাবাদ অঞ্চল
বাজার	মুম্বাই ও সংলগ্ন অঞ্চল সুতা ও সুতিবস্ত্রের বিরাট বাজার। কার্পাস-বয়নশিল্পের প্রারম্ভে স্থানীয় বাজার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারের পরিধিও ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে।	মুম্বাই অঞ্চলের মতো আমেদাবাদ এবং সংলগ্ন এলাকা সুতা ও সুতিবস্ত্রের ব্যাপক বাজার সৃষ্টি করেছে। আমেদাবাদ-কেন্দ্রিক মিলগুলি প্রথমে আঞ্চলিক বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য গড়ে উঠলেও পরে ক্রমবর্ধমান বাজারের পরিধিটিকে বিস্তৃত করেছে।
মূলধন	স্থানীয় পার্শি এবং ভাটিয়া শিল্পপতিদের মূলধন, ব্যাবসায়িক দক্ষতা এবং পরিচালন ব্যবস্থা এখানে কার্পাস-বয়নশিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করে।	গুজরাটি সম্প্রদায়ের মূলধন, ব্যবসায়িক দক্ষতা এবং মিল পরিচালনায় যোগ্যতা আমেদাবাদ অঞ্চলে কার্পাস-বয়নশিল্পের একদেশিভবনে সাহায্য করে।
শ্রমিক	কঙ্কন, সাতারা, শোলাপুর অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষিজীবী মানুষ মুম্বাই-এর কাপড়কলগুলিতে শ্রমিক হিসেবে যোগদান করে।	সুরাট, কলোল, নাদিয়ার, মাহেসানা এবং নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে প্রচুর প্রান্তিক কৃষিজীবী পরিবার আমেদাবাদ অঞ্চলের কার্পাস-বয়নশিল্পে শ্রমিক হিসেবে জীবিকা অর্জন করে।

১৪.৩.২.৪ ভারতের কার্পাস-বয়নশিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Indian Cotton Textile Industry)

কার্পাস-বয়নশিল্প প্রকৃতিগতভাবে অস্থাণু (Foot-loose) চরিত্রের। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বা বাজারের বিন্যাস ও গঠন তারতম্য কার্পাস-বয়নশিল্পকে অবস্থানগত (location) ভাবে অস্থিতিশীল করে।

■ **প্রথম পর্যায় :** উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতীয় কার্পাস-বয়নশিল্প প্রধানত রপ্তানি-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য মুম্বাই বন্দরকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠে। কিন্তু চিনে ভারতীয় সুতার রপ্তানি-বাজার বিধ্বস্ত হওয়ার পর বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র হিসাবে মুম্বাই তার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। কারণ কার্পাস-বয়নশিল্প যদি শুধু মুম্বাই-তেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে মহারাষ্ট্র-গুজরাট থেকে তুলা মুম্বাই পাঠিয়ে সুতা প্রস্তুত করে — বস্ত্র বয়ন করার পর দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে সেই বস্ত্র জোগান দিলে মুম্বাই-তে কাঁচামাল পাঠানোর খরচ এবং মুম্বাই থেকে বস্ত্র পরিবহনের ব্যয় বেশি হয়। তুলনায়, অনেক কম খরচে বস্ত্র উৎপাদন করা যায়, যদি কার্পাস-বয়নশিল্পের কেন্দ্র মুম্বাই-এর পরিবর্তে অন্য কোনো নতুন বাজার বা বাজারের কাছাকাছি গড়ে তোলা যায়। কারণ সে-ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় কম হয়। ফলে ভারতীয় কার্পাস-বয়নশিল্পে বিকেন্দ্রীকরণের যুগ শুরু হয়।

■ **দ্বিতীয় পর্যায় :** বিকেন্দ্রীকরণ পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমেদাবাদ ভারতের কার্পাস-বয়নশিল্পের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং সেই প্রসিদ্ধি এতদূর ছড়িয়ে পড়ে যে, আমেদাবাদ "ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার" নামে পরিচিত হয়। কারণ কাঁচামাল, বাজার, পরিবহন, শক্তি, শ্রমিক, মূলধন সবই আমেদাবাদ এবং সন্নিহিত অঞ্চলে সম্মিলিতভাবে কার্পাস-বয়নশিল্প গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সমর্থ হয়।

■ **তৃতীয় পর্যায় :** বিকেন্দ্রীকরণের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় কার্পাস-বয়নশিল্প আরও বেশি বাজারমুখী হয়ে ওঠে। কারণ রেল ও সড়ক পরিবহনের বিস্তৃত এবং উন্নততর সুযোগ; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুতের অধিকতর নির্ভরযোগ্য জোগান; দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা স্বল্প মজুরিতে দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্তি; জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান আয়তন এবং জনসাধারণের ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্রয়ক্ষমতা, নতুন সুতা ও বয়ন কেন্দ্রগুলিকে নাগপুর, শোলাপুর, আকোলা, ইন্দোর, কোয়েম্বাটুর, সালেম, তুতিকোরিন, ওয়ারঙ্গল, চেন্নাই প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। উন্নততর পরিবহন, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্বল্প মজুরি ইত্যাদির আকর্ষণে গড়ে ওঠা নতুন কার্পাস-বয়নকেন্দ্রগুলি হল—

(১) **উন্নততর পরিবহন বন্দোবস্ত-নির্ভর কার্পাস-বয়নশিল্পকেন্দ্র :** নাগপুর, শোলাপুর, কোলাপুর, জলগাঁও, নাসিক, ভবনগর, পোরবন্দর, রাজকোট, ভারুচ, ভদোদরা।

(২) **বিদ্যুৎকেন্দ্র-নির্ভর কার্পাস-বয়নশিল্পকেন্দ্র :** মেত্তুর, তিরুনেলভেলি, সালেম, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই, চেন্নাই।

(৩) **স্বল্প মজুরি-নির্ভর কার্পাস-বয়নশিল্পকেন্দ্র :** ইন্দোর, গোয়ালিয়র, রতলম, উদমলপেট, পোলাচি, বিরুধনগর, ফলতা, ফুলেশ্বর, সোদপুর, আলওয়ে, আলেপ্পে।

(৪) **বাজার-নির্ভর কার্পাস-বয়নশিল্প :** কানপুর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, হাওড়া, বেলঘরিয়া, হায়দরাবাদ, কোচিন, পাটনা, কটক।

১৫.৩.২.৩ ভারতের কার্পাস-বয়নশিল্পের সমস্যা (Problems of the Indian Cotton Textile Industry)

ভারতীয় কার্পাস-বয়নশিল্পের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি হল—

(১) **কাঁচামালের সমস্যা :** দীর্ঘ আঁশের তুলার জোগান ভারতে স্বল্প এবং সে-কারণে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে এখনো উৎকৃষ্ট তুলা আমদানি করতে হয়। দেশে তুলার জোগান চাহিদার তুলনায় কম।

(২) **স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি :** ভারতীয় কার্পাস-বয়নশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। ফলে, দেশজ বস্ত্রের উৎপাদন ব্যয় বেশি। তবে উৎপাদন ব্যয় যতটা বৃদ্ধি পায়, সুতিবস্ত্রের দাম ততটা বৃদ্ধি পায় না বলে মিলগুলি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং রুগ্ন হয়ে পড়ে।

(৩) **রপ্তানি-বাণিজ্যে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা :** হল্যান্ড, জার্মানি, জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় বস্ত্রসম্ভারের প্রধান প্রতিযোগী। এই দেশগুলিতে উৎপাদিত বস্ত্রের উৎপাদন ব্যয় কম। ফলে রপ্তানি-বাজারে ভারত পিছিয়ে রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতে সুতিবস্ত্রের উৎপাদন ব্যয়ের ১৬% মজুরি, ৩৫% তুলা ও ২০% রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির জন্য খরচ করা হয়।

(৪) **পুরাতন যন্ত্রপাতি :** বস্ত্রশিল্পের 'ওয়ার্কিং পার্টি' (Working Party for the Cotton Textile Industry)-র সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভারতীয় বয়নশিল্পের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি ২৫ বছরের পুরোনো। ফলে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের উৎপাদন ব্যয় বেশি, উৎপাদন ক্ষমতা কম এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মান আশানুরূপ নয়।

(৫) **'র‍্যাশানালাইজেশন' বা আধুনিকীকরণের সমস্যা :** কার্পাস-বয়নশিল্পে ব্যবহৃত অধিকাংশ যন্ত্রপাতি পুরাতন হলেও, সেগুলি বদল করার কিছু অসুবিধা আছে। যেমন — আধুনিকীকরণের জন্য অর্থের অভাব; বিদেশি যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি; ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন প্রভৃতি।

(৬) **কৃত্রিম তন্তুজাত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা :** রসায়ন শিল্পের উন্নতির ফলে দেশে রেয়ন, নাইলন, পলিয়েস্টার, ডেক্রন প্রভৃতি সুলভ কৃত্রিম তন্তুর জোগান ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তন্তুগুলি টেকসই এবং এ-ধরনের তন্তুজাত বস্ত্রের গুণগত মান ভালো। সুতরাং, দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে কৃত্রিম তন্তু তুলা বা কার্পাসের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

(৭) **রুগ্ন ও বন্ধ মিলগুলির সমস্যা :** ১৯৭২ সালে এক সরকারি অর্ডিন্যান্স বলে ৪৬টি রুগ্ন মিলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য জাতীয় বস্ত্রশিল্প কর্পোরেশন (National Textile Corporation — NTC) গঠন করা হয়। বর্তমানে ১০৪টি মিল রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। বাকিগুলি সরকারি পরিচালন ব্যবস্থার অধীনে রয়েছে।

(৮) **পরিকাঠামোগত সমস্যা :** ভারতীয় কার্পাস-বয়নশিল্প যে-সমস্ত পরিকাঠামোগত সমস্যায় আক্রান্ত সেগুলি হল— শক্তির স্বল্প জোগান; পরিবহনের অসুবিধা; অকট্রয় বা রাজ্য পণ্য প্রবেশ করের চাপ প্রভৃতি।

(৯) **শ্রমিক অসন্তোষ :** শ্রম ব্যুরোর হিসাব অনুসারে, শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘটের প্রভাবে শুধু মুম্বাই এলাকায় ৬৩২ কোটি শ্রমদিবস নষ্ট হয়।

(১০) **কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি :** তুলার দাম বিগত দুই দশকে প্রায় ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বস্ত্র মিলগুলির লাভজনক হয়ে ওঠার পথে, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

(১১) **ক্ষুদ্রায়তন তাঁত ও বৃহদায়তন কাপড়কলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব :** ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার ও ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁত ও মিলের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় একান্ত জরুরি। নচেৎ হস্তচালিত তাঁতগুলি শক্তিচালিত তাঁতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অলাভজনক হয়ে উঠছে।

■ **কার্পাস-বয়নশিল্পের ভবিষ্যৎ ও সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীত সরকারি নীতি (Future of Cotton Textile Industry and Govt. Policies for Resolving Problems)**

(১) ১৯৮৫ সালে নতুন বস্ত্র-নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৭৫০ কোটি টাকার Textile Modernization Fund গঠন করা হয়েছে।

(২) জাতীয় তুলা বস্ত্র নিগমকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

(৩) মিলগুলিতে সুতার বন্টন ঠিক রাখার জন্য টেকস্টাইল কমিশনারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

(৪) রুগ্ন মিলগুলি লাভজনক করে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এ-কাজের জন্য NTC (National Textile Corporation) বা জাতীয় বস্ত্রশিল্প করপোরেশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

(৫) যোশী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার অন্তঃশুল্ক হ্রাস করেছে।

(৬) সুতিবস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য Cotton Textile Export Promotion Council গঠন করা হয়েছে।

(৭) বস্ত্রশিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে দেশে আমেদাবাদ, মুম্বাই প্রভৃতি স্থানে পাঁচটি গবেষণা সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

(৮) হস্তচালিত তাঁত শিল্পে সুতার জোগান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে Mill Gate Price Scheme (MGPS)-এর পরিধি বাড়ানো হয়েছে।[১]

(৯) মিলগুলিতে প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) চালু রয়েছে।

ভারতীয় কার্পাস-বয়নশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সুতিবস্ত্রের বাজার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, নতুন বস্ত্রনীতির জন্য তাঁত শিল্পের অগ্রগতি হয়েছে। তৃতীয়ত, 'মূলধনী দ্রব্যের রপ্তানি প্রসার প্রকল্পের' মাধ্যমে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। চতুর্থত, টাকার পূর্ণ বিনিময় যোগ্যতা ও আমদানি শুল্ক হ্রাসের ফলে ভারতীয় কার্পাস-বয়ন শিল্পের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

■ **ভারতীয় কার্পাস-বয়নশিল্পে WTO চুক্তি "Agreement on Textile and Clothing" (ATC)-এর প্রভাব**

বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী, ভারতের কার্পাস-বয়নশিল্প WTO চুক্তি "Agreement on Textile and Clothing (সংক্ষেপে ATC) থেকে লাভবান হবে। ভারতের অর্থমন্ত্রক-এর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ২০১৪-১৫ সালে ভারত বিদেশের বাজারে প্রায় ৬৫৬·৬ কোটি ডলার মূল্যের রেডিমেড বস্ত্র রপ্তানি করেছে।[২] বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার "বহু তন্তু চুক্তি" (Multi Fibre Agreement—MFA) অনুসারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ভারত তথা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ থেকে বস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে না বা আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। রপ্তানিকারী দেশগুলিকেও রপ্তানি দ্রব্যের গুণমান, আন্তর্জাতিক স্তরে যে উচ্চ গুণমান স্বীকৃত হয়, তা বজায় রাখতে হবে। তবে আগামী দিনে চিন, তাইওয়ান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং কার্পাস-বয়নশিল্পে এই দেশগুলির আধুনিক পরিকাঠামো এবং উন্নত মানের উৎপাদিত বস্ত্র ভারতের মাথা-ব্যথার কারণ হবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে ভারত Global System of Trade Preferences (GSTP), Preferential Trade Agreement (PTA), Broad based Trade and Investment Agreement (BTIA) প্রভৃতি প্রকল্প চালু করেছে।

[১,২] *India, 2015, 2017 Govt. of India*

বিদ্যুৎ (Electricity)

দেশের অগ্রগতি ও উন্নতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিদ্যুৎ কোন দেশের উন্নতির চাবিকাঠি। যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুতের উৎপাদন শিল্পের উন্নতি, পরিবহন ও কৃষির উন্নতি ঘটায় এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি গড়ে। ভারতের প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয় প্রায় শতবর্ষ পূর্বে এবং কলকাতার বিদ্যুৎকরণ হয় লন্ডন শহরের বিদ্যুতকরণের এক দশক পর। তবে স্বাধীনতার পরবর্তী বিদ্যুৎকরণের সময়েই ভারতের উন্নতি ঘটে। এবং তা হয় 1950-51 হতে 2003-04 সালের মধ্যে বিদ্যুতের উৎপাদন 53 বৎসরে 57 গুণ বৃদ্ধি ঘটে । উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে 2.3 হাজার মেগাওয়াট হতে (1950-51) 131.4 হাজার মেগাওয়াট (2003-04)। ঐ সময় ব্যবহার অনুসারে বিদ্যুৎকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(1) জলবিদ্যুৎ
(2) তাপ বিদ্যুৎ
(3) আণবিক (নিউক্লিয়ার) বিদ্যুৎ

জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity)

● **ভূমিকা (Introduction) ঃ** বিপুল জলরাশিকে কাজে লাগিয়ে নদীর প্রবাহপথে টারবাইন ঘুরিয়ে ডায়নামোর সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে বলে জলবিদ্যুৎ। জলবিদ্যুৎ একটি প্রবহমান শক্তি সম্পদ। এর যোগান কখনও শেষ হয় না। তবে বৃষ্টিপাতের বা তুষার গলা জলের পরিমাণ কম হলে উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, জলবিদ্যুৎ কোনপ্রকার গচ্ছিত সম্পদ নয় অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হলে তা সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব হয় না।

বর্তমানে কোন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে বিদ্যুৎ শক্তির ভূমিকা অনবদ্য। বিদ্যুৎ শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত বিভিন্ন সম্পদ যথা কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের মত খনিজ দ্রব্য একটি অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। জল থেকে উৎপন্ন হয় বলে এরূপ বিদ্যুৎ শক্তিকে বলে জলবিদ্যুৎ। এই শক্তির অপর নাম White Coal বা **শ্বেত কয়লা**।

● **জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাসমূহ (Conditions for the generation of Hydro-Electricity)** জলবিদ্যুৎ জল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি হলেও যে কোনও অবস্থায় বা যে কোন পরিবেশে জলের অবস্থান থাকলেই জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব হয় না। তাই যে অনুকূল পরিবেশে এই শক্তি উৎপাদন সম্ভব তাকে প্রধান দুটি ভাগে ও কতগুলি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশ
বেগবতী প্রবাহমান নদী,
বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি,
পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও জলের যোগান,
জলাধার নির্মাণের সুবিধা,
বনভূমির অবস্থান ও
পলল মুক্ত ও বরফমুক্ত অববাহিকা

অর্থনৈতিক পরিবেশ —
প্রয়োজনীয় চাহিদা,
শক্তির অন্যান্য উৎসের অনুপস্থিতি,
শিল্প কেন্দ্রের নৈকট্য এবং
মূলধনের যোগান।
দক্ষ শ্রমিক ও প্রযুক্তি বিদ্যা,
সরকারী সহায়তা।

ভারতে পর্যাপ্ত জলশক্তি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা থাকলে এখানে মৌসুমী বৃষ্টির অনিশ্চয়তার কারণে নদীগুলিতে জলপ্রবাহের তারতম্য ঘটে ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃত্রিম জলধারা সৃষ্টি করে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে হয়।

ভারত নদীমাতৃক দেশ তাই এখানকার জলশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে শক্তিসম্পদের বিপুল চাহিদাকে সুলভে মেটান সম্ভব।

ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে বেশি উপযোগী কারণ ঃ—

1. দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির প্রবাহপথে বন্ধুর ও পার্বত্য এলাকার পরিমাণ বেশি, আবার প্রপাতের সংখ্যাও বেশি। 2. দক্ষিণ ভারতে শক্তি উৎপাদনের প্রধান সম্পদ কয়লার অভাব। এবং 3. ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পায়নের চাহিদা।

দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির প্রধান ত্রুটি হল এগুলি বর্ষার জলে পুষ্ট, ফলে সারাবৎসরব্যাপী বিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে এই নদীগুলি আদর্শ নয়। তবে বিকল্প শক্তির অভাবে উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে বেশি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত করা হয়।

ভারতের জলবিদ্যুতের উৎপাদনের সম্ভাবনা (Potentiality of Hydropower in India) :

ভারত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে পৃথিবীতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। যদিও জলবিদ্যুত শক্তির প্রথম উদ্ভব ঘটে উনবিংশ শতাব্দির শেষে, তবুও এর প্রকৃত সূচনা হয় স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে।

সারণি

ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ধারা (1950-51 থেকে 2003-2004)

[উৎপাদন 1000 Kw/ প্রতি ঘন্টায়]

বছর	জলবিদ্যুৎ	বছর	জলবিদ্যুৎ
1950-51	0.6	1997-98	22.9
1960-61	1.9	1998-99	22.4
1970-71	6.4	1999-00	23.9
1980-81	11.8	2000-01	25.1
1990-91	18.8	2001-02	26.3
1995-96	21.0	2002-03	26.8
1996-97	21.7	2003-04	29.5

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নতি প্রকল্পে এদেশে 1975 সালে জাতীয় হাইড্রোইলেকট্রিক্ পাওয়ার কর্পোরেশন (N.H.P.C) স্থাপিত হয়। এই সংস্থা ভারতে মোট আটটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ করেছে। এদের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা 2,193 মেগাওয়াট/ঘন্টা। ভারত বর্তমানে যে বিদ্যুৎ সঙ্কটের মধ্যে চলেছে সেই অবস্থায় জলবিদ্যুতের যথাযথ উৎপাদন ও সরবরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি

বিভিন্ন নদী অববাহিকা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা 1000Mw পরিমাণ লোড ফ্যাক্টরে

অববাহিকা	সম্ভাবনা	অনুপাত (শতকরা হিসাবে)
সিন্ধু	20.0	23.8
ব্রহ্মপুত্র	35.5	41.7
গঙ্গা	11.0	13.1
মধ্যভারতীয় উপত্যকা	3.0	3.6
পশ্চিমবাহিনী নদী	6.0	7.1
পূর্ববাহিনী নদী	9.0	10.7
মোট	**84.0**	**100.00**

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (Generation of Hydel Power) :

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখানকার নদীবিন্যাস অনুসারে একে প্রধান দুটি বিভাগ ও কতকগুলি উপবিভাগে বিভক্ত করা হল।

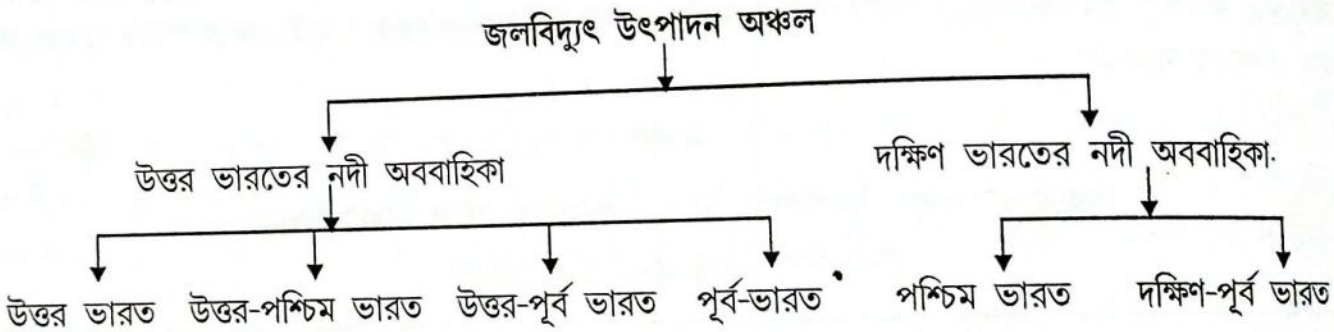

প্রধান প্রধান নদী উপত্যকা পরিকল্পনা

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	পরিকল্পনার নাম
1. মাইথন, পাঞ্চেৎ	1. দামোদর নদী উপত্যকা পরিকল্পনা
2. তিলাইয়া, ম্যাসাঞ্জোর	2. ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা
3. মুকুটমণিপুর	3. কংসাবতী পরিকল্পনা
4. ভাক্‌রা, কোটলা ও গাঙ্গুয়াল	4. ভাক্‌রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা
5. হীরাকুঁদ ও চিপলিরা	5. মহানদী (হীরাকুঁদ) পরিকল্পনা
6. গান্ধীসাগর, রানাপ্রতাপ সাগর জওহর সাগর	6. চম্বল পরিকল্পনা

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	পরিকল্পনার নাম
7. তুঙ্গভদ্রা	7. তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা
8. নাগার্জুন	8. নাগার্জুন পরিকল্পনা
9. রিহান্দ	9. রিহান্দ পরিকল্পনা
10. হনুমান	10. কুশী পরিকল্পনা
11. বাল্মিকী সাগর	11. গণ্ডক পরিকল্পনা
12. কয়না	12. কয়না পরিকল্পনা
13. নিরাব, শোলায়ার, পরাম্বিকুলাম, টুক্কাভাবু, পেরুবারিপল্লম ও টেক্কাদি	13. পারম্বিকুলাম, আলিয়ার পরিকল্পনা

● **উত্তরের ভারতের নদী অববাহিকা (Northern River Basin) :**

উত্তর ভারতের নদীগুলি বিভিন্ন কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

(i) এই নদীগুলি প্রধানত হিমালয় পর্বতের বরফগলা জলে পুষ্ট। ফলে, এখানে বৃষ্টি এবং বরফগলা জল নদীগুলিতে সর্বদা জলের সরবরাহ করে থাকে। (ii) নদীগুলি প্রধানত উচ্চপর্বত বা বন্ধুর ভূমিভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে নদী বেগ যথেষ্ট বেশি থাকে। (iii) উত্তর ভারতে অন্যান্য শক্তির উপস্থিতি জলশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে উত্তর ভারতে জলবিদ্যুতের যথেষ্ট ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

(A) উত্তর ভারতের নদী উপত্যকা অঞ্চলের উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ—

● উত্তর ভারতের জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশের গঙ্গা ও সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি স্থাপন করা হয়েছে। এগুলি প্রধানত স্থানীয় শিল্প, কৃষি ও দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে সহায়তা করে থাকে।

1. জম্মু-কাশ্মীর — জম্মু-কাশ্মীর অঞ্চলে দুটি বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে। (a) নিম্ন ঝিলাম নদীর উপর বরমুলাতে 105 মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এটি ঝিলাম বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। (b) অপর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে চন্দ্রভাগা বা চেনাব নদীর উপর। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সালাল হাইড্রেল নামে পরিচিত।

2. হিমাচল প্রদেশ — হিমাচল প্রদেশের প্রকল্পগুলি বিপাশা-শতদ্রু নদীর সঙ্গমস্থলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান সরকারের মিলিত প্রচেষ্টায় গৃহীত হয়। এই রাজ্যের প্রধান প্রকল্পগুলি নিম্নরূপঃ

(a) **বয়রা সিউল প্রকল্পটি** বয়রা, সিউল ও ভাদেল এই তিনটি নদীকে কেন্দ্র করে স্থাপিত হয়েছে। এর উৎপাদন ক্ষমতা 180 মেগাওয়াট।

(b) **পঙ-বাঁধ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র** ঃ 1974 সালে শতদ্রু নদীর উপর পঙবাঁধ তৈরী করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই অঞ্চলের উৎপাদন ক্ষমতা 360 মেগাওয়াট।

(c) **দেহার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র** — দেহারের কাছে শতদ্রু নদীর উপর যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় তা দেহার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বলে পরিচিত। উৎপাদন ক্ষমতা 990 মেগাওয়াট।

3. উত্তরপ্রদেশ — উত্তরপ্রদেশে গঙ্গা ও যমুনার উপর বিভিন্ন বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে গঙ্গা ও তার উপনদী, শাখানদীগুলি কেবলমাত্র বৃষ্টির জল নয় বরফগলা জলেও পুষ্ট থাকে বলে সারা বছর জলের কোন অভাব হয় না। প্রধান বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি হলঃ

(a) **গঙ্গা খাল জলবিদ্যুৎ গ্রিড ঃ**

হরিদ্বার হতে মীরাট পর্যন্ত গঙ্গা খালে 7টি কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। (i) বাহাদুরাবাদ, (ii) মহম্মদপুর, (iii) চিতৌরা, (iv) সালওয়া, (v) ভোলা, (vi) পলিয়া, (vii) সুমেরা।

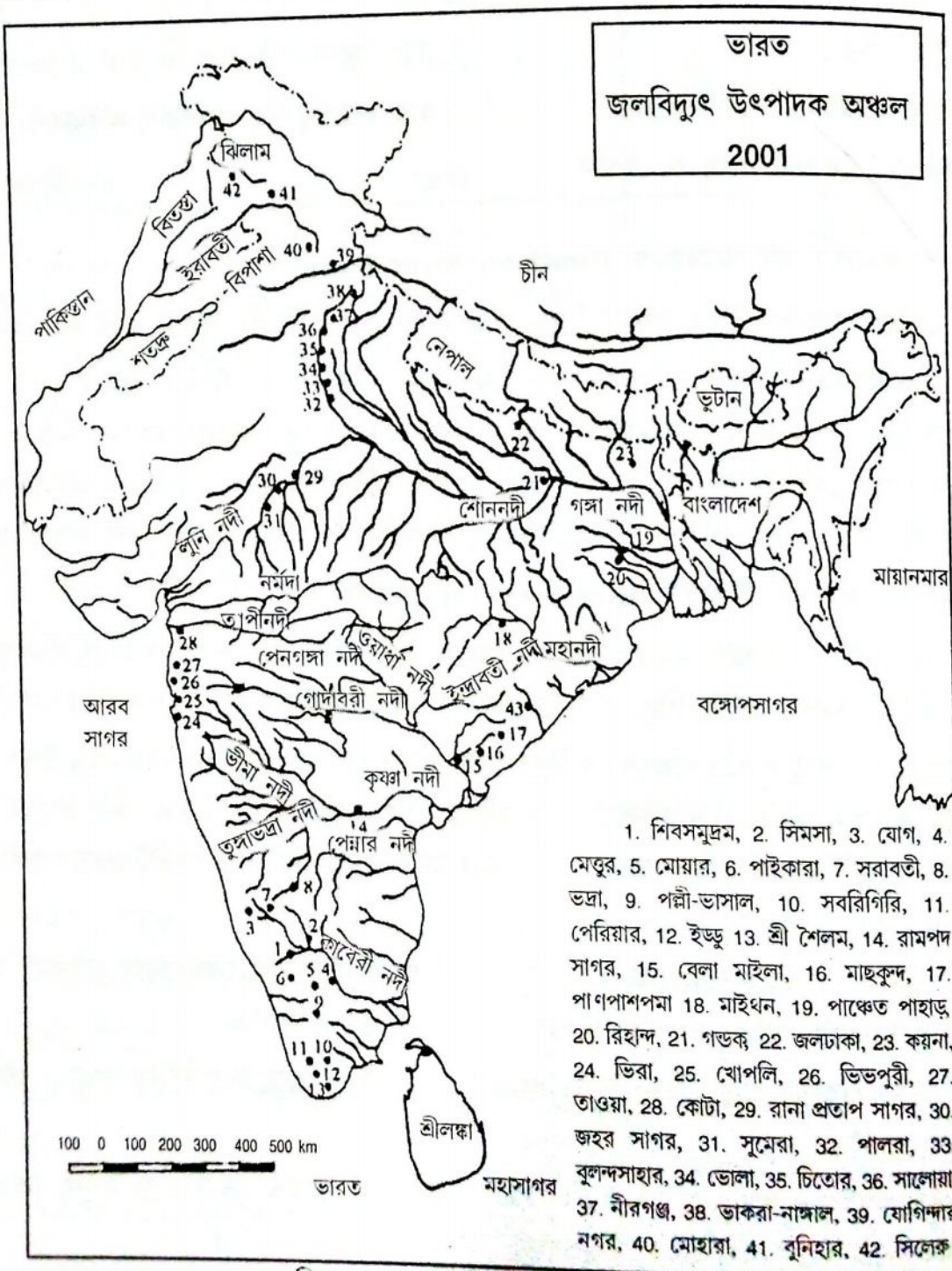

চিত্র 75 ঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র

এই সাতটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি পরস্পর একসঙ্গে যুক্ত বলে এগুলিকে একত্রে গ্রিড বলে। উৎপাদনের পরিমাণ 45.2 মেগাওয়াট (2002)।

(b) **রামগঙ্গা প্রকল্প ঃ**

গঙ্গার উপনদী রামগঙ্গার উপর বাঁধ দিয়ে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গঠিত হয়েছে। এই কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা 198 মেগাওয়াট।

(c) **রিহান্দ প্রকল্প ঃ**

এখানকার রিহান্দ নদীর উপর বাঁধ দিয়ে এই প্রকল্পটি স্থাপিত হয়েছে। এখানের উৎপাদন ক্ষমতা 300 মেগাওয়াট।

(d) **যমুনা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঃ**

যমুনা ও তার উপনদী টোন এর জলকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয় —

(i) যমুনা স্টেজ i থেকে v উৎপাদন ক্ষমতা	114.8 মেঃ ওয়াট
(ii) যমুনা স্টেজ ii (চিবরো) উৎপাদন ক্ষমতা	240.0 মেঃ ওয়াট
(iii) যমুনা স্টেজ iii উৎপাদন ক্ষমতা	120.0 মেঃ ওয়াট
	মোট 474.8 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ

উত্তরাঞ্চল ঃ

এখানে তেহরি প্রকল্পের কাজ চলছে। তবে এখানে গঙ্গা, যুমনা, সারদা নদীর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি 1000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।

4. উত্তর-পশ্চিম ভারত ঃ

(a) **পাঞ্জাব** — পাঞ্জাবের প্রধান দুটি প্রকল্প হল ভাকরা-নাঙ্গাল এবং উল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

(i) ভাকরা-নাঙ্গাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঃ শতদ্রু নদীর উপর বাঁধ দিয়ে যে বিদ্যুৎ প্রকল্পটি স্থাপন করা হয়েছে তা ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প নামে পরিচিত। এই বাঁধের দুই তীরে অর্থাৎ বাম ও ডান তীরে মোট আটটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে 1,355 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

(ii) উল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঃ পাঞ্জাবের উল নদীতে বাঁধ দিয়ে 95 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে।

(b) **রাজস্থান ঃ** রাজস্থানের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি চম্বল নদীকে কেন্দ্র করে স্থাপিত হয়েছে। এখানে দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

(i) **রানাপ্রতাপ সাগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** রাজস্থানের কোটা শহর থেকে 51 কিমি উত্তরে চম্বল নদীর উপর এই প্রকল্পটি স্থাপিত হয়েছে। এখানকার উৎপাদন ক্ষমতা 172 মেগাওয়াট।

(ii) **জওহর সাগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** কোটা থেকে আরও 30 কিমি উত্তরে চম্বল নদীর উপর এই প্রকল্পটি স্থাপিত হয়েছে। এখানে 99 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

5. উত্তর পূর্ব ভারত ঃ

(a) **মণিপুর ঃ** মণিপুরের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি লোক্‌টাক্ হ্রদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এর উৎপাদন ক্ষমতা 105 মেগাওয়াট।

(b) **মেঘালয় ঃ** মেঘালয়ে দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। (i) **কর্দমকুলই কেন্দ্র**-উৎপাদন ক্ষমতা 60 মেগাওয়াট এবং (ii) **খংডং কেন্দ্র ঃ** উৎপাদন ক্ষমতা 25 মেগাওয়াট ।

(c) **অসম ও ত্রিপুরা ঃ** এই দুই রাজ্যে কোনও বৃহৎ প্রকল্প নেই, তবে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে।

(d) **সিকিম ঃ** নিম্ন লাগিয়াপা অঞ্চলে অবস্থিত। উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র 2 মেগাওয়াট।

উপরের রাজ্যগুলি ব্যতিত নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরাম, অসম ও ত্রিপুরায় কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রকল্পে অল্প জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

6. পূর্ব ভারত ঃ

(a) বিহার ও ঝাড়খণ্ড ঃ এই অঞ্চলের প্রধান জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির নাম —

(i) **দামোদর নদী প্রকল্প ঃ** এই প্রকল্পে দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে মাইথন, পাঞ্চেৎ তিলাইয়া প্রভৃতি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে মোট 104 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

(ii) **সুবর্ণরেখা ও কোশী প্রকল্প ঃ এই** প্রকল্প দুটি থেকে যথাক্রমে 20 মেগাওয়াট এবং 30 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

(b) ওড়িশা ঃ

(i) **হীরাকুঁদ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র** — মহানদীর উপর এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি হীরাকুঁদ অঞ্চলে অবস্থিত। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে '270 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

(ii) **চিপলিমা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র** — মহানদীর উপর স্থাপিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উৎপাদন ক্ষমতা 72 মেগাওয়াট।

এছাড়া (iii) ওড়িশা বালিমেল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

(c) পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম ঃ

(i) **ম্যাসাঞ্জোর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** ময়ূরাক্ষী নদীর উপর স্থাপিত এই জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে 6 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

(ii) **জলঢাকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** উত্তরবঙ্গের জলঢাকা নদীর উপর 30 মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে।

(iii) **সিদ্রগম ঃ** উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং শহরের বিদ্যুতের চাহিদা অনুসারে দার্জিলিং শহরের কাছে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে। 1897 সালে এটি স্থাপিত হয়েছিল।

(iv) **নিম্ন লাগিয়াপা কেন্দ্র ঃ** এই কেন্দ্র থেকে 12 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। তবে বর্তমানে সিকিমে রঙ্গিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলছে।

(B) দাক্ষিণাত্যের নদী অববাহিকা অঞ্চল (Southern River basin Area) ঃ

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তর অঞ্চল অপেক্ষা দক্ষিণ অঞ্চলের সম্ভাবনা অনেক কম।